নবায়নযোগ্য জ্বালানিই সংকটের একমাত্র সমাধান

সাজেদ কামাল

'২০৫০ সালের ভেতরেই আমাদের সকল চাহিদা নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকেই মেটানো সম্ভব হবে। এই পরিবর্তন যে শুধু সম্ভব তা-ই নয়, বরং এটা সাশ্রয়ীও বটে। এই রিপোর্ট আমাদের জানাচ্ছে যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে সকলের জন্য সুলভ জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোও পুনর্গঠিত হবে, যাতে করে বিশ্ব ব্যবস্থায় এক টেকসই পরিবর্তন সূচিত হবে।'–The Energy Report: 100% Renewable Energy by 2050, World Wildlife Fund, 2011

'আজকাল সকলেই নবায়নযোগ্য জ্বালানির কথা বলছে। ব্যাপারটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই জ্বালানি ব্যবস্থাই যে ভবিষ্যৎ সংকট উত্তরণের একমাত্র সহায়– এমনটা অবিশ্বাস করার মতো মানুষ এখন খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে।'– হারম্যান শিয়ার (১৯৪৪-২০১০), জার্মানির নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম পথিকৃৎ

বিশ্বজুড়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে তা বেশ কিছু যৌক্তিক কারণেই সকলকে আশাবাদী করে তুলেছে। গবেষণা, অনুসন্ধান, উন্নয়ন, চাহিদা আর বিনিয়োগের কারণে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে সংকট অবসানের বিশ্বাস এখন সবচেয়ে বেশি। এর একদিকে আছে প্রথাগত জ্বালানির ব্যবহারের দৌড়ে ধ্বংসের খাদে পড়ে যাওয়ার শঙ্কা, অপরদিকে রয়েছে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে আসন্ন সংকট থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা। এখন আমাদের একদিকে ঝড়ঝঞ্ঝা-জলোচ্ছ্বাস, খরা, বন্যা, তেজস্ক্রিয়তার ভয়, মাটি-পানি আর বাতাসের দূষণ, নিয়ত কমতে থাকা রিজার্ভের বাড়তে থাকা জ্বালানি মূল্য, দেশে দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর যুদ্ধের চোখরাঙানি, আর অপরদিকে রয়েছে দূরদর্শী নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে কমতে থাকা খরচের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার শুরু করে পুরো বিশ্ব ব্যবস্থায় একটা স্থিতিশীল, শান্তিময় সামগ্রিক পরিবর্তন আনয়নের হাতছানি। ইতোমধ্যেই জার্মানি, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও মালদ্বীপ ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের লক্ষ্য নির্ধারণ করে বাকি সবাইকে পথ দেখাচ্ছে।

বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নতুন জ্বালানি ব্যবস্থা উন্নয়নে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে। ২০২০ সালের মধ্যেই এ অঙ্গরাজ্যে ৩৩ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়াই ২০৪৫ সালের মধ্যেই শতভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের ঘোষণা দিয়েছে। হাওয়াই গভর্নর ডেভিড ইগে এ সংক্রান্ত বিলটিতে সই করে আইনে পরিণত করে বলেন, 'জ্বালানি তেল আমদানিতে হাওয়াই বছরে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার খরচ করে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ। কিন্তু স্ব স্ব ক্ষেত্রে উৎপাদিত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে আমাদের এই পদার্পণ আমাদেরকে বছরপ্রতি শত কোটি ডলারের তেল আমদানির বোঝা কমিয়ে অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি পরিবেশেরও সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিত করবে।' বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নতুন জ্বালানি ব্যবস্থা উন্নয়নে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে। ২০২০ সালের মধ্যেই এ অঙ্গরাজ্যে ৩৩ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যেই এ লক্ষ্য ৫০ শতাংশে উন্নীত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে গভর্নর জেরি ব্রাউন কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি গবেষণা সংস্থা NREL প্রণীত Renewable Energy Futures Study শীর্ষক গবেষণা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বর্তমান বাজারে প্রচলিত প্রযুক্তির সাহায্যেই ২০৫০ সালের মধ্যে পুরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবুজ জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। অন্যদিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ মারা প্রেনটিস ২০১৫ সালে প্রকাশিত Energy Revolution: The Physics and Promise of Efficient Technology বইটিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সুলভে ব্যবহারের অপার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, *'শুধুমাত্র বায়ু কিংবা সৌরশক্তি ব্যবহার করেই চাহিদার শতভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই সম্ভব তা এই বইটিতে আমি প্রমাণ করে দেখিয়েছি। অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের সংমিশ্রণ নিশ্চিতভাবেই এ প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করে তুলবে।'*

অবাক করার মতো বিষয় হচ্ছে, 'তেলের দেশ' সৌদি আরবও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সৌরশক্তি থেকে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে, যা দিয়ে পুরো দেশের এক-তৃতীয়াংশ চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। তরল সোনার এই দেশ ২০৩০ সালের মধ্যেই তেলের জোগানক্ষমতা হারিয়ে ফেলার শঙ্কায় সবুজ জ্বালানিভিত্তিক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ছক কাটছে। ৬৮ বছর বয়স্ক সৌদি যুবরাজ তুর্কি আল ফায়সাল ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সভায় বলেন যে তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই সৌদি আরবে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার দেখে যেতে চান। অপরদিকে দীর্ঘ ২১ বছর সৌদি আরবের জ্বালানিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে ক্ষমতার প্রচণ্ডতায় যিনি বিশ্বের জ্বালানি বাজারের অঘোষিত সম্রাটে পরিণত হয়েছিলেন, আলী আল-নাঈমি, তিনি ২০১৩ সালে ওয়াশিংটনে আয়োজিত এক সেমিনারে অংশগ্রহণকালে বলেন, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসা।' সেখানে ২০০৯ সালে বিকল্প জ্বালানি গবেষণার জন্য বিশ্বসেরা প্রযুক্তিসম্পন্ন বাদশাহ আবদুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ঘটনাটি

সৌদি আরবের বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার রাষ্ট্রীয় আয়োজনের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

চীনের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে চ্যাম্পিয়ন দেশও নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে টার্গেট নিয়েছে তার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই ভবিষ্যতে দূষিত জ্বালানি ব্যবহারের পুরো চিত্রটা পাল্টে যাওয়ার নিশানা রয়েছে। ইতোমধ্যেই তারা নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থার প্রযুক্তি উৎপাদনে বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। চীনের নিজস্ব সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনও দিনকে দিন বাড়ছে। চীনের জাতীয় জ্বালানি কর্তৃপক্ষের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়টাতে সেখানে সৌরভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ২৩ হাজার মেগাওয়াট। তখন তারা ২০১৫ সালের মধ্যে এই উৎপাদন ৩৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার কাজ করছিল।

চীনের জাতীয় জ্বালানি কর্তৃপক্ষের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়টাতে সেখানে সৌরভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ২৩ হাজার মেগাওয়াট। তখন তারা ২০১৫ সালের মধ্যে এই উৎপাদন ৩৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার কাজ করছিল।

ভারতও বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের দৌড়ে সামনের সারিতেই অবস্থান করছে। তা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে একটা সমন্বিত নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেছে, যা পৃথিবীতে অনন্য। সেখানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশেষায়িত এজেন্সি IREDA-র মাধ্যমে সৌর-বায়ু-মাইক্রো হাইড্রো-বায়োগ্যাস এবং বায়োমাসভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে অঞ্চলভিত্তিক কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ রকম কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে কেরালায় কোচিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ১২ মেগাওয়াটের সৌরভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বে প্রথম শতভাগ সবুজ জ্বালানি ব্যবহারকারী বিমানবন্দরের মর্যাদা লাভ করে। ভারত সরকার এখন দেশের সকল বিমানবন্দরকে এই ব্যবস্থায় আনয়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

ভারতে এই জ্বালানি ব্যবহারেও রয়েছে বৈচিত্র্য। সেখানে ৫ ওয়াট থেকে শুরু করে ৬০০ মেগাওয়াটের সৌরভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে। গুজরাটের ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার প্লান্টটি বিশ্বে সর্ববৃহৎ, যা মাত্র ১৪ মাসে নির্মাণ করা হয়েছে। এইসব কার্যক্রম আরো জোরদার করতে আগামী এক দশকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ১০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের মতো পরমাণু বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশও সবুজ জ্বালানির প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছে। 'ওপেক' নিয়ন্ত্রিত তেলের বাজারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে ফ্রান্স পরমাণু বিদ্যুতের দিকে ঝুঁকেছিল; যার ফলে সেখানে বর্তমানে ৫৮টি রিঅ্যাক্টর ব্যবহার করে ৭৭ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। সেখানে বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৫ শতাংশ আর জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ৮ শতাংশ। কিন্তু পরমাণু বিদ্যুতের ওপর এই অতিনির্ভরতার কারণে নিরাপত্তা ঝুঁকি, দুর্ঘটনার শঙ্কা, বর্জ্য অপসারণ জটিলতা আর মেয়াদোত্তীর্ণ রিঅ্যাক্টর অপসারণ খরচ পুরো ব্যবস্থার ওপর যে চাপ সৃষ্টি করেছে তা থেকে মুক্তির একমাত্র দিশা হিসেবে ফ্রান্স নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে বেছে নিয়েছে। এ কারণেই ফ্রান্সের জ্বালানি ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সংস্থা অউউগউ-র রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি, সেখানে ২০৫০ সালের মধ্যেই শতভাগ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এরই অংশ হিসেবে ২০১৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর লিয়নে 'পজিটিভ এনার্জি' প্রজেক্ট উদ্বোধন করা হয়। পজিটিভ এনার্জি প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো যতটা জ্বালানি ব্যবহার হচ্ছে সেই প্রকল্প থেকেই নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে অন্তত ততটা বা তারও বেশি জ্বালানি উৎপাদন করা।

এ বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের অ্যাশ সেন্টারে 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনর্জাগরণ' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জেরার্ড আরদ উদ্বোধনী ভাষণে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সম্ভাবনার দিকটি তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে গবেষণা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত জটিলতা নিরসনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইতোমধ্যেই একটি ক্রমশ প্রসারিত বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। রাষ্ট্রদূত আরদ জোর দিয়ে বলেন, 'ফ্রান্সও এই বিপ্লবে অংশ নিতে চায়।'

ফ্রান্সের এই ধরনের লক্ষ্য নির্ধারণ আর বাস্তবায়নের মনোভাব নিশ্চিতভাবেই এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে। একই সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় এই জোর মনোযোগ পারমাণবিক বিদ্যুতের সাম্রাজ্যে একটা বড়সড় ধাক্কাই দিতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে পরমাণু বিদ্যুৎকে জলবায়ু পরিবর্তনের 'মুশকিলে আসান' হিসেবে জাহির করার প্রবণতা মুখ থুবড়ে পড়বে বলেই মনে হচ্ছে। বাস্তবিক অর্থে পরমাণু বিদ্যুৎকে প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, জীববৈজ্ঞানিক আর পরিবেশগত বিবেচনায় বাতিল হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার সময় এসেছে। ১৯৫৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান লুইস স্ট্রস গর্ব করে বলেছিলেন, 'আমাদের সন্তানরা এত সস্তায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে, যা কল্পনাতীত।' অথচ এই সস্তা বিদ্যুতের কাল আর কখনোই আসেনি। বিপরীতে পৃথিবী দেখেছে থ্রি মাইল আইল্যান্ড, চেরনোবিল আর ফুকুশিমার মতো দুর্ঘটনা। অথচ মিথ্যা আর ভুলে ভরা প্রচারণা চালিয়ে বিভিন্ন দেশে করে ফেলা হয়েছে ৪৩৭টি পারমাণবিক চুল্লি। এগুলোর বেশির ভাগই রয়েছে কানাডা, চীন, ফ্রান্স, ভারত, জাপান, রাশিয়া, সুইডেন, যুক্তরাজ্য আর যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে। আশার কথা হচ্ছে, পরমাণু বিদ্যুতের জারিজুরি এখন সকলের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। একেকটি চুল্লির মাত্র ৩০ থেকে ৪০ বছরের বয়সকালে তেজস্ক্রিয়তা, অপসারণ জটিলতা, দুর্ঘটনা, জন্মগত ত্রুটি, পারমাণবিক অস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণ আর রাজনৈতিক জটিলতার যে ক্ষত তৈরি করে, তা বয়ে বেড়াতে হয় অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। আর এ কারণেই অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, ফিলিপাইন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ইতোমধ্যেই নিজ নিজ দেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যান্য দেশও তাদের দেখিয়ে দেওয়া পথ অনুসরণ করতে শুরু করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় শুরু হয়েছে 'একটি কম পরমাণু কেন্দ্র'র আন্দোলন, যার মাধ্যমে জনগণকে আরো বেশি বিদ্যুৎসাশ্রয়ী আর

নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতি আগ্রহী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১৫ সালের মে মাসে ফিনল্যান্ড ওল্কিলুওটো-৪ পরমাণু চুল্লি বসানোর উদ্যোগ বাতিল ঘোষণা করে। এই চুল্লির অত্যাধুনিক তৃতীয় প্রজন্মের প্রযুক্তি আসার কথা ছিল ফ্রান্স থেকে।

১৯৮৬ সালে ঘটে যাওয়া ইউক্রেনের চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর আরেকটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে জাপানের ফুকুশিমায় ২০১১ সালের ১১ মার্চ। এর মাধ্যমে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবেই পরমাণু বিদ্যুৎ থেকে সরে আসার আরেকটি বার্তা। ঐ ঘটনার পর পরমাণু বিদ্যুতের ওপর অতিনির্ভরশীল জাপানও এই বিপজ্জনক বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি থেকে সরে আসার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী জনমতের চাপে প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিকো নোদার ডেমোক্রেটিক পার্টি নতুন নীতি প্রণয়নের আহ্বান জানিয়ে বলে, 'আমাদের প্রতিটি কাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত ২০৩০ সালের মধ্যে জাপানের পরমাণু বিদ্যুতের পরিমাণ শূন্যতে নামিয়ে আনা।' ফুকুশিমায় বর্তমানে ২২ শতাংশ বিদ্যুৎ আসছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে। সেখানকার নগর কর্তৃপক্ষ ২০৪০ সালের মধ্যেই এই পরিমাণ ১০০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। জাপানে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বিরোধী জনমতে জোর হাওয়া দিচ্ছে সেখানকার সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ ব্যবহারের বিশাল সম্ভাবনা। শুধুমাত্র ফুকুশিমায়ই ২০১৪ সাল থেকে ২৬ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন শুরু হয়েছে। সেই সাথে রয়েছে ২ মেগাওয়াটের বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা। সেখানে ৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরো দুটি বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পরিকল্পনাধীন। বর্তমানে ফুকুশিমায় ৫৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার সোলার পার্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে।

জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এক ঘোষণায় বলেছেন, 'পরমাণু বিদ্যুতের মুখোশ খুলে গেছে। আমরা বুঝে গেছি যে এটা কোনোভাবেই পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ নয়। এখন আমাদের বিপজ্জনক পারমাণবিক বর্জ্য সংরক্ষণ করার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। এত ঝুঁকি সত্ত্বেও পরমাণু কেন্দ্রগুলো নতুন করে পূর্ণোদ্যমে চালানোর অর্থ হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের অপরাধ।' এ কারণেই ফুকুশিমা দুর্ঘটনার পর জাপানের জ্বালানিনীতির খোলনলচে পাল্টে ফেলা হয়েছে। এখন সেখানে ২০৩০ সালের মধ্যেই সৌর, বায়ু, জল আর জিওথার্মাল ব্যবহার করে মোট উৎপাদনের ২০ শতাংশ অর্জনের ঘোষণা এসেছে। এতসব উদ্যোগের পাশাপাশি পরমাণু উৎপাদন সামগ্রীর জোগানদানের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে জোর রাজনৈতিক লবিংও চলছে। এ যেন ঠিক এক মাদকাসক্তের আচরণ। জীবন ক্ষয়ে যাচ্ছে অথচ এর কারণটাকে ত্যাগ করা যাচ্ছে না! অথচ জাপানের মতো ভূমিকম্প ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় পরমাণু বিদ্যুৎকে যে আর কিছুতেই 'নিরাপদ' নামে ট্যাগ করা যাবে না, এটা একেবারেই নিশ্চিত। সেই নীতিমালাকে 'আত্মঘাতী' বলা চলে। তাই জোর লবিং আর রাজনীতির ছক কাটাকুটির খেলা সত্ত্বেও জনগণের আন্দোলনের মুখে জাপানকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পথেই হাঁটতে হবে। সে আন্দোলন চলছে এবং সরকারি নীতিমালায় তার সুফলের আভাসও কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে।

জাপানে পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী আন্দোলন নতুন নয়। সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে আর সুশীল সমাজের জনমত গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরমাণু বিদ্যুৎ বর্জনের ডাক আগেও এসেছে। কিন্তু সরকারের শক্তিশালী নীতিগত অবস্থান আর পরমাণু বাণিজ্য নেটওয়ার্কের অর্থশক্তির দাপটে সব যুক্তি, তর্ক, গবেষণা এতদিন বেশ ভালোভাবেই আড়াল করে রাখা গেছে। সব শেষে ফুকুশিমা দুর্ঘটনার প্রচণ্ড ধাক্কায় পরমাণু বিদ্যুৎ সাম্রাজ্যের মিথ্যা আর ভুল যুক্তির গাঁথুনি দিয়ে গড়ে তোলা তাসের প্রাসাদ মাটির সাথে মিশে গেছে।

> পরমাণু বিদ্যুতের জারিজুরি এখন সকলের কাছেই ধরা পড়ে গেছে। একেকটি চুল্লির মাত্র ৩০ থেকে ৪০ বছরের বয়সকালে তেজস্ক্রিয়তা, অপসারণ জটিলতা, দুর্ঘটনা, জন্মগত ত্রুটি, পারমাণবিক অস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণ আর রাজনৈতিক জটিলতার যে ক্ষত তৈরি করে, তা বয়ে বেড়াতে হয় অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। আর এ কারণেই অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, ফিলিপাইন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ইতোমধ্যেই নিজ নিজ দেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অনবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর অতিভরসার আর্থিক ও পরিবেশগত বিপদের বিপরীতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের সর্বব্যাপী সাফল্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোও এখন এই জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে। তবে যেসব দেশে এখনো জ্বালানি ব্যবহারের আগ্রাসী ক্ষুধা তৈরি হয়নি কিংবা যাদের মাথাপিছু বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদন এখনো অনেক কম, সেসব দেশের জন্য শুরু থেকেই আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানি আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। বিপরীতে চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে রাজনীতির জটিল হিসাব-নিকাশ, কমিশনের ভাগ-বাটোয়ারা আর নীতি প্রণয়নে অদূরদর্শিতা। চোরাই টাকার শক্তির দাপট আর বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনার অভাবের সুযোগ নিয়ে উন্নয়নশীল অনেক দেশই বর্তমানে উন্নত বিশ্বের বাতিল কয়লা, গ্যাস আর পরমাণু প্রযুক্তির ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে। এর বিপরীতে এশিয়া, লাতিন আমেরিকা আর আফ্রিকাজুড়ে কয়লা আর পরমাণু বিদ্যুৎ বিরোধী আন্দোলন এক ভরসার ক্ষেত্র তৈরি করছে। তবে এর চূড়ান্ত সাফল্য আসবে তখনই, যখন কয়লা-পরমাণু বিরোধী এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির পক্ষের আন্দোলনকে এক করে দেওয়া যাবে।

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেশে দেশে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে জারি রয়েছে রাজপথের আন্দোলন। অপরদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে গৃহীত হচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি। আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে প্রযুক্তির আধুনিকায়ন আর সংকট মোকাবিলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার। দেশে দেশে সংঘবদ্ধ প্রান্তিক মানুষের জোর দাবির ধাক্কায় কেন্দ্রের সরকারগুলো নড়েচড়ে বসলেও দ্রুত পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পূরণের জোয়ারের কাল এখনো শুরু হয়নি। ২০১৪ সালের আইপিসিসির রিপোর্টে ইতিবাচক নীতিগত পরিবর্তন, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে সতর্কতা, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণসহ নানা ইতিবাচক দিক তুলে ধরার পাশাপাশি এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে আসন্ন সংকট মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে বর্তমানের এই কাজগুলোও যথেষ্ট নয়। বরং আরো বেশি দ্রুততায় আর আরো বেশি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এখনই কাজ শুরু করা উচিত। জার্মান অর্থনীতিবিদ ও আইপিসিসির

কো-চেয়ারম্যান ওটমার ইদেনহোফার বলেন, 'পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে আমাদের আর এক দশকও অপেক্ষা করার সময় নেই।'

কোপ ২১ এর মতো সম্মেলনগুলো আমাদের আশা জাগায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় ২০০ সদস্য রাষ্ট্রের পূর্ণ সম্মতিতে গৃহীত 'প্যারিস চুক্তি' আমাদের ভরসা দেয়। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এই চুক্তি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়নে বাধ্য করার মতো কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই অস্থিরতাবিহীন পৃথিবী গড়ে তুলতে আমাদের যে স্বপ্ন তা ধারণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও বাস্তবায়নের সীমার নাগাল এখনো আমরা পাইনি। কেননা দুর্যোগের ক্ষত, দুর্ঘটনার নিশানা আর আসন্ন ঝুঁকির নানা আলামত আমাদের সামনে স্পষ্ট হলেও ইতোমধ্যেই ফুলেফেঁপে ওঠা কয়লা আর পরমাণু শিল্পের দোর্দণ্ড প্রতাপ আর প্রভাব সবকিছু ভুলিয়ে রাখতে চাইছে। গণমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটা বিপরীত জনমত গড়ে তুলতে চাইছে। সেই সাথে নীতিনির্ধারণী মহলে পূর্ণ দখল জারি রাখতে রাজনীতিতে চলছে কালো টাকার বিনিয়োগ। দুর্নীতি, ক্ষমতার শক্তি আর অদূরদর্শিতার বেড়া ডিঙিয়ে বেশ কিছু সংস্থা, দপ্তর, সংগঠন আর দল কাজ শুরু করেছে, তবে বাকিদের চোখ এখনো বন্ধই রয়েছে।

শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রচলন খুবই সম্ভব, যদি আমরা এর ব্যবহার সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা শুরু করি। কেবল জ্বালানি সমস্যার সমাধান হিসেবেই নয়, প্রকৃত অর্থে 'টেকসই উন্নয়ন' এবং 'উন্নতি'র মৌলিক উপাদানও নবায়নযোগ্য জ্বালানি। কাজেই এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির জন্য আমাদের আরো বেশি করে জানতে হবে আর তার বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে আরো ব্যাপকভাবে তা ব্যবহার করতে হবে। আমাদের সামনে বর্তমান সংকট যেন সম্ভাবনার ডালা নিয়ে হাজির হয়েছে। এখান থেকে উত্তরণের আয়োজন বাতিল ব্যবস্থাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সুযোগ করে দিয়েছে। আমাদের বুঝতে হবে যে বর্তমান সমস্যার সমাধান কোনো প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মধ্যে লুকিয়ে নেই। এটি একমাত্রিক কোনো সংকট নয়, তাই এর সমাধানে বহুমাত্রিক পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই। এই পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের মানসিকতায়, সংস্কৃতিতে, এমনকি রাজনীতিতে পর্যন্ত। আমাদের স্বার্থপর প্রাচুর্যের জীবন পরিহার করে সাম্য আর ন্যায়নিষ্ঠার জীবন স্বীকার করতে হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে সমষ্টির স্বার্থকে ধারণ করতে হবে।

জ্বালানি সংকট আর পরিবেশগত দুর্যোগ রুখতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের বিপ্লব এখন আর কোনো তত্ত্বগত ধারণা নয়, বরং তা সামনে এগোনোর একমাত্র পথ। আশার কথা হচ্ছে, বিশ্বজুড়ে শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই পথে আমরা হাঁটতে শুরু করেছি। লক্ষ্যের নিশানা ঠিক রাখতে পারলে গন্তব্যে পৌছানো খুব কঠিন হবে না। তবে আমাদের এই গন্তব্যে পৌছানোর আগ্রহটা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে।

সাজেদ কামাল: ***The Renewable Revolution: How We Can Fight Climate Change, Prevent Energy Wars, Revitalize the Economy and Transition to a Sustainable Future*** ***এবং*** ***The Untapped Energy Mine: The Revolutionary Scope of Renewable Energy to Fight Climate Change, Revitalize the Economy and Gain Energy Independence for Bangladesh*** *গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ৩০ বছর ধরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত উন্নয়নে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। শিক্ষকতা করেছেন ব্যান্ডিস বিশ্ববিদ্যালয়, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং এনটিওক নিউ ইংল্যান্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুলে। তিনি একাধারে কবি, শিল্পী, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সমালোচক, অনুবাদক।*

ই-মেইল: arskamal@verizon.net

ইংরেজি থেকে এ প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন **মওদুদ রহমান**